মননে শ্রীরামকৃষ্ণ

স্বামী সুহিতানন্দ

স্বামী প্রেমেশানন্দজী একবার বলেছিলেন, ''আমার ইচ্ছে করে একটা রচনা লিখব—'গদাধরের ভ্রমণকাহিনি।' কথামৃতের পাতা খোলো, পাতায় পাতায় দেখবে শ্রীরামকৃষ্ণ ভ্রমণ করছেন বিভিন্ন স্তরে—এই ক্ষর, তারপরই অক্ষর, আবার পুরুষোত্তম। কখনও তিনি 'ক্ষর'—ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র গদাধর—কামারপুকুরের কথা বলছেন; কখনও 'অক্ষর' হয়ে ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্ম হয়ে আছেন। কাউকে বলছেন, ''বলো, তোমার অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ আমি তো সব জানি?'' কারও মাথায় পা দিয়ে বলছেন, ''তোর কাশীতেই মৃত্যু হবে।'' শ্রীশ্রীমাকে বলছেন, ''একদেশে গেছলুম, সেখানকার লোক সব সাদা সাদা।'' কখনও জানিয়ে দিচ্ছেন—নরেনের ভিতর কেশবের মতো আঠারোটা শক্তি রয়েছে। আবার কখনও 'ডুব ডুব ডুব রূপসাগরে' বলতে বলতে একেবারে ডুব। বাহ্যজগৎ ছাড়িয়ে কোথায় চলে যাচ্ছেন—তখন তিনি পুরুষোত্তম। কখনও তিনি সগুণ, কখনও নির্গুণ। দ্বৈত, অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত—সব ভাবে তাঁর অনায়াস সঞ্চরণ—যেমন পাখি আকাশে উড়ে বেড়ায়, মাছ জলে খেলে বেড়ায়।

বলা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণের এই একটি নতুন সৃষ্টি 'বিজ্ঞানী ভাব'। অবতারপুরুষ এই স্তরেই থাকেন। তাঁর স্পর্শে নরেন্দ্রনাথ রেলিং, ঘোড়ার গাড়ি, খাবার থালা—সব চৈতন্যময় দেখেছিলেন। আগে বস্তু, পরে চৈতন্যকে অনুভব করছিলেন তিনি। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ সকল বস্তুতে প্রথমে চৈতন্য উপলব্ধি করতেন, পরে সেই সেই বস্তু বলে বোধ করতেন। সকলে সিঁড়ি দিয়ে ছাদে ওঠে, তাঁর ছিল আগে ছাদে উঠে তারপর সিঁড়ি দেখা। এটিই শ্রীরামকৃষ্ণের 'বিজ্ঞানী ভাব'।

তাঁর মধ্যে অদ্বৈত-দ্বৈত-বিশিষ্টাদ্বৈত—তিন ভাবের খেলা সর্বদা চলত। ঠাকুর তিন ভাবেরই সাক্ষী হয়ে থাকতেন। যেমন, শ্রীশ্রীমাকে একবার একজন জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ''আপনার স্বরূপ কি সবসময় মনে থাকে?'' মা বললেন, ''তা কি আর সবসময় থাকে? কিন্তু যখনই ইচ্ছা করি তখনই এসে পড়ে।'' আমি হয়তো স্বপ্ন দেখছি যে আমার ইষ্ট সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন, আমি তাঁকে প্রণাম করতে যাচ্ছি। এমন সময় কেউ যদি আমার ঘুম ভাঙিয়ে দেয় তাহলে আমি বিরক্ত হই, কারণ আবার ঘুমোলেও স্বপ্নটা ইচ্ছেমতো আমি আর দেখতে পারব না। কিন্তু অবতারপুরুষ তা পারেন। তিনি ইচ্ছেমতো যেকোনও স্তরে যেতে এবং সেখান

থেকে ফিরতে পারেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সর্বদাই তা করতেন। সেজন্যই প্রেমেশানন্দজী 'গদাধরের ভ্রমণকাহিনি' লিখতে চেয়েছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ যেন অবতারেরও সাক্ষী। তাঁর একটি দর্শন হয়েছিল। ''দেখলাম খোলটি (দেহটি) ছেড়ে সচ্চিদানন্দ বাহিরে এল, এসে বললে, 'আমি যুগে যুগে অবতার'।'' অর্থাৎ অবতার যেন শ্রীরামকৃষ্ণের থেকে বেরিয়েছেন। মনে আসে স্বামীজী বলেছেন, তিনি ভগবানেরও বাবা। সেজন্য ঠাকুরের কেউ ইতি করতে পারেন না। রোম্যাঁ রোল্যাঁ প্রমুখ পণ্ডিতবর্গ তাঁর কথা আলোচনা করতে গিয়ে থই পাচ্ছেন না। কেউ বলছেন 'A Phenomenon', কেউ 'Face of Silence'। তিনি যেন 'অচিনে গাছ', তাঁকে চেনা যায় না।

আমাদের মনের যেমন ক্রমবিকাশ বা evolution হয়, তেমনই অবতারেরও evolution আমরা দেখাতে পারি। শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণকে জড়শক্তি তথা শারীরিক শক্তির প্রয়োগ করতে হয়েছিল রাবণ, কংস প্রভৃতি অসুরদের দমন করার জন্য। বুদ্ধদেব সাম্য এনেছিলেন চৈতন্যশক্তির দ্বারা। শংকরাচার্য জগতের কল্যাণ করেছেন প্রজ্ঞাশক্তিতে। চৈতন্যদেবের ভিতর বুদ্ধের সাম্যও ছিল, শংকরের প্রজ্ঞাও ছিল; সঙ্গে মহাভাব। শ্রীরাধিকার মহাভাব নিয়ে তিনি গম্ভীরায় ছিলেন আঠারো-উনিশ বছর। এর পরবর্তী অবতারপুরুষকে নতুন কিছু দিতে হবে—তা না হলে তাঁকে 'original' বলা যাবে না। চৈতন্যদেব যেখানে থামলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ সেখান থেকেই শুরু করলেন। ''মাইরি বলছি আমি ঈশ্বর ছাড়া কিছু জানি না''—এই ছিল তাঁর কথা। শৈশব থেকে আজীবন, ঈশ্বর ছাড়া তাঁর আর কিছুই ছিল না। বলতেন, ''তোমরা পাঁচটা নিয়ে আছ, আমি একটা নিয়েই থাকি।'' অর্থাৎ এক ঈশ্বরকেই তিনি নানাভাবে আস্বাদন করেন।

তাঁর সম্বন্ধে বলা হয়েছে—'ধৃতসহজসমাধি'। গান, বাঁশির শব্দ, ছবি, দৃশ্য—সামান্য উদ্দীপনেই তাঁর মন সঙ্গে সঙ্গে সমাধিস্থ হত। হাজরামশাই একবার ঠাকুরকে বলেছিলেন, ''আপনি নরেন-টরেন ওদের জন্য অত ভাবেন কেন? ভগবানের চিন্তায় মন স্থির করুন।'' শুনে ঠাকুর ভগবানের চিন্তায় মন লীন করলেন। চুলদাড়ি সব কদমফুলের মতো খাড়া হয়ে গেল। অনেক চেষ্টায় তাঁর মন দেহে ফেরানো গিয়েছিল। ওই বিশুদ্ধসত্ত্ব শরীর নিয়ে জগতে লীলা করা অতি কঠিন ছিল। সেজন্য তাঁকে শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীকে আনতে হয়েছিল। শ্রীশ্রীমা মহাশক্তি। পূর্ব পূর্ব অবতারে মাতৃশক্তির এতবড় বিকাশ দেখা যায়নি। এই সঙ্ঘের সৃষ্টিকর্ত্রী মা, রক্ষাকর্ত্রীও মা। মাকে প্রথম বেলুড় মঠে এনে স্বামীজী একটা সাদা ধবধবে রুমালে মায়ের পদরজ সংগ্রহ করে রেখেছিলেন, আজও সেই শ্রীমৃত্তিকা ঠাকুরের গর্ভমন্দিরে পূজা হয়। মায়ের ওই পদরজই আমাদের সঙ্ঘের শক্তি, আমাদের রক্ষয়িত্রী।

মায়ের জীবনেও আমরা দেখছি চৈতন্যশক্তিরই লীলা। সকলের প্রতি শুভকামনা, আশীর্বাদ ছাড়া আর কিছু নেই। শুধুমাত্র প্রেম, কল্যাণচিন্তা দিয়েই গড়া এই অপরূপ মাতৃবিগ্রহ। আর স্বামীজী? প্রেমেশানন্দজী বলতেন, তাঁর সবই 'Superlative degree'। কোনও বিষয়েই তাঁকে অন্যের চেয়ে কম ভাবা যায় না। শ্রীরামকৃষ্ণ ও নরেন্দ্রনাথকে প্রথম পর্যায়ে দেখলে মনে হয় যেন দুই মহাবীর কুস্তি লড়ছেন। এ আধ্যাত্মিক মহাসংগ্রাম। নরেন চাইছেন সমাধিস্থ হয়ে থাকতে, শ্রীরামকৃষ্ণ চাইছেন নরেনের অতি ক্ষমতাশালী চৈতন্যশক্তিকে জগতের কাজে লাগাতে। তাই তিনি জগন্মাতার শরণাপন্ন হয়ে বলেছিলেন, ''মা, ওকে মায়ায় বদ্ধ করো।''

শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজী—একত্রে এই মহাচৈতন্যশক্তি এসে জগতে ব্রহ্মকুণ্ডলিনীর জাগরণ ঘটালেন। তাঁরা বিজ্ঞানসম্মতভাবে দেখালেন, ঈশ্বর পরীক্ষিত সত্য এবং ঈশ্বরলাভ

করতে হলে পবিত্রতা চাই। ঈশ্বর সত্য—এই উপলব্ধির করার পর যদি কেউ এ-জগতে ফেরে, তাহলে সে দেখবে জগৎ ঈশ্বরের মতোই সত্য। শ্রীরামকৃষ্ণ জগতকে দেখেছেন চৈতন্যশক্তির লীলা বলে। এই চৈতন্যের সেবাকেই তিনি বলেছেন 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'। এই সেবা করতে গিয়ে অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স—জাগতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি— উভয়কেই সমভিত্তিতে দাঁড় করানো যায়। এই সেবা, এই আদর্শ একা ধারণ ও বহন করা সম্ভব নয়। এজন্য প্রয়োজন সমভাবের মানুষদের একত্রিত হয়ে কাজ করা—অর্থাৎ সঙ্ঘ। শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে থাকতেই সকলকে একত্রিত করার চেষ্টা করেছিলেন। বলতেন, ''আহা, ওদের (ত্যাগী সন্তানদের) একটা ঐক্য করে বেঁধে দিতে পারতুম!" তাঁর ভাবাদর্শে গৃহী ও সন্ন্যাসী ভক্তগণ আজ কাঁধে কাঁধে মিলিয়ে এগিয়ে চলেছেন। এতে এক মহা আধ্যাত্মিক প্লাবনের সৃষ্টি হয়েছে। ঠাকুরের যেকোনও একটা বাণী স্মরণ মনন করলেই তাঁরা সেই সর্বোচ্চ লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবেন। যেমন, ''প্রতিমায় তাঁর পূজা হয়, আর জীয়ন্ত মানুষে কি হয় না?"

ইসলাম আর খ্রিস্টধর্মে নতুন অবতারের কোনও প্রসঙ্গ নেই। শ্রীরামকৃষ্ণ এই দুটি ধর্মই পালন করেছেন। এইসব ধর্মে যাঁরা আন্তরিকভাবে ঈশ্বরকে ডাকতে চাইবেন তাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে সেই সত্য খুঁজে পাবেন, আশ্রয় পাবেন। আমরা অনেককে দেখেছি, যাঁরা ভগবান যিশুর চিন্তা করতে করতে শ্রীরামকৃষ্ণকেই যিশু বলে উপলব্ধি করেছেন। আবার অনেকে শ্রীরামকৃষ্ণকে চিন্তা করতে করতে যিশুকে পেয়েছেন। উভয়কে অভিন্নভাবে তাঁরা দর্শন করেছেন।

সঙ্ঘের নিয়মাবলীতে স্বামীজী বলেছেন, ''এই জগতের আদর্শ সেই অবস্থা... যখন চৈতন্যময়ী শক্তি জড়া শক্তির উপর সম্পূর্ণ আধিপত্য স্থাপন করিবে;... পশুবলপ্রয়োগ পুরাকালের স্বপ্নের ন্যায় লোকস্মৃতি হইতে একেবারে বিলুপ্ত হইবে। যখন এই ভূমণ্ডলে প্রেমই একমাত্র সর্বকার্যের প্রেরয়িতা হইবে,—তখনই সমগ্র মনুষ্যজাতি ব্রহ্মণ্যবিশিষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণ হইয়া যাইবে।" ঠাকুর-মা-স্বামীজী আসার পর থেকে কীভাবে চৈতন্যশক্তির বিকাশ ঘটেছে তা দেখে আমরা স্তম্ভিত হই। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনই তার প্রমাণ। আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করে ইংরেজরা প্রায় সমগ্র এশিয়া (জাপান বাদে) ও আফ্রিকাকে ক্রীতদাস করে ফেলেছিল। তাদের কৃষ্টি, ধর্ম, শিক্ষা, ব্যবসা, স্বাধীনতা—সব হরণ করেছিল। এই দেশগুলি এক এক করে স্বাধীন হয়েছে চৈতন্যশক্তির বিকাশে। এ-শক্তি জনগণের শক্তি। স্বামীজী বলছেন, প্রজাপুঞ্জ শক্তির আধার। প্রেমেশানন্দজী একটি গানে বলেছেন, ''হেলায় পড়ে ধূলায় শয়ান/ বিশ্বসভায় তার প্রয়োজন।" আমায় বলেছিলেন, ''জনগণের মুভমেন্ট লক্ষ করেই কথাটি লিখেছিলাম। ঠাকুর আসার পর থেকেই এই গণ-আন্দোলন শুরু হয়েছে।"

বিশ্ব জুড়ে কয়েকটি জাতির অন্যায় উৎপীড়নে বিবেকবান মানুষেরা অস্বস্তিবোধ করেছিলেন। রোম্যাঁ রোল্যাঁ প্রমুখের রচনায় আমরা এই ইঙ্গিত পাই। খ্রিস্টধর্মকে রাজনৈতিক ডৌলে সাজিয়ে নিয়ে আপন স্বার্থসিদ্ধিতে ব্যবহার করা হচ্ছিল, পরাধীন জাতির মানুষের উপর অকথ্য অত্যাচার চলছিল ভগবান যিশুর নামে। প্রাচ্য তো বটেই, পাশ্চাত্যেরও সাধারণ মানুষ, সৎ মানুষেরা এতে হাঁপিয়ে উঠেছিল। তাদের মনে হচ্ছিল, মানুষ কি স্বাধীনভাবে নিজের মতো করে ঈশ্বরকে ডাকতে পারে না? তাদেরই জন্য শ্রীরামকৃষ্ণকে বলতে হয়েছিল, তাঁর সব 'সাদা সাদা ভক্ত' আসবে।

'সাদা সাদা ভক্ত' প্রসঙ্গে একটি ঘটনা বলি। একবার রাশিয়ার একটি মেয়েকে জ্যোতীরূপানন্দ মঠে পাঠিয়েছেন। বেশ ভাল, ভক্তিমতী, বিনয়ী।

ওকে মায়ের একটা প্রসাদি শাড়ি দিলুম। আর একটি জার্মান মেয়েকে বাণেশানন্দ পাঠিয়েছেন। তাকেও প্রসাদি শাড়ি দিয়েছি। ভাবলাম ওরা শাড়ি আর কী করে পরবে, তাই বললাম, ''শাড়ি না পরতে পারো তো কেটে গাউন টাউন করে নিয়ো।'' কয়েকদিন পর তিনজন মেয়ে এসে প্রণাম করল। একজন বলছে, ''মহারাজ, ওদের চিনতে পারলেন না?'' তখন দেখি, সেই দুটি মেয়ে মায়ের শাড়ি পরে এসেছে! কথাটা যে বলল সে বাঙালি, আমেরিকায় থাকে। ও-ই ওদের শাড়ি পরিয়ে নিয়ে এসেছে। তিনটি মেয়েকে মনে হচ্ছে যেন তিন বোন। তিনটি মহাদেশ যেন এক হয়ে গেছে। ভালবাসা, ধর্ম—সবাইকে এক করে দিতে পারে।

আর একটি ঘটনা। ফিজি গিয়েছি 'মেডিটেশন হল' উদ্বোধন করতে। সেখানে দেখলাম পাঁচটি ছবি ঢাকা আছে। তিনটি তো বুঝলাম ঠাকুর-মা-স্বামীজীর ছবি। বাকি দুটি কার ছবি ওরা আমায় বলল না। বলল, ''কাল জানতে পারবেন।'' বুঝলাম সাসপেন্সে রাখতে চায়। উদ্বোধনের দিন স্থানীয় চার্চ থেকে ফাদার আর ভক্তেরা এসে, নতুন চার্চ উদ্বোধন হলে বাইবেল পাঠ আর যা যা আচার পালন করতে হয়, সব করলেন। তাঁরা যিশুখ্রিস্টের ছবির আবরণ উন্মোচন করলেন। মোল্লা এসে তাঁদের করণীয় আচারগুলি পালন করে অপর ছবির আবরণ উন্মোচন করলেন। ইসলাম ধর্মে তো কারও ছবি চলে না, ছবিতে লেখা আছে 'আল্‌হক' অর্থাৎ 'The Truth'। তিনি কোরান পাঠ করলেন। আমিও কিছু বললাম। তারপর সবাই একসঙ্গে বসে খাওয়া হল। তার পরদিন দেখি ওই হলে এক ভদ্রমহিলা কয়েকটা বাচ্চা নিয়ে বসে আছেন। জিজ্ঞাসা করলুম, ''আপনি রোজ আসেন বুঝি?'' তিনি বললেন, ''না, আমি খ্রিস্টান। এটা তো আমাদের চার্চ হয়ে গেছে এখন, ফাদার এসে consecrate করে প্রভু যিশুকে বসিয়েছেন। তাই আমি ভেবেছি এখানে এসে প্রেয়ার করব।''

টেক্সাসের অস্টিনে একটি আশ্রম হয়েছে আমাদের। স্থানীয় এক ভক্তমহিলা তার সমস্ত দায়িত্ব নিয়েছেন। সব কাজ অম্লানবদনে করে যাচ্ছেন। যেখানে যত ত্রুটি হচ্ছে তার দায় যেন তাঁরই! আর তাতে কী তৃপ্তি তাঁর! শ্রীরামকৃষ্ণকে যারা ভালবাসে, তাঁকে যারা গ্রহণ করে, তাদের চরিত্রে একটা নতুন মাত্রা এসে যায়।

সাওপাওলোতে আমাদের আশ্রমের যিনি ভাইস প্রেসিডেন্ট, তিনি ওখানকার খুব বড় ডাক্তার। এসেছিলেন, একটু গল্প হল। বললেন, তাঁর তিন ছেলে। বড় ছেলে ডাক্তার, মেজো চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট। এই পর্যন্ত বলে চুপ করে আছেন। জিজ্ঞাসা করলাম, ''আর থার্ড সন?'' বললেন, ''এই আশ্রমটি আমার থার্ড সন। একে নিয়েই দুশ্চিন্তা। এ এখনও ঠিকমতো দাঁড়াতে পারেনি।''

তাই বলি, আমাদের ভক্তরা অতি উচ্চস্তরের, কারণ তাঁরা নিঃস্বার্থ। শ্রীরামকৃষ্ণকে ভালবেসে, তাঁর কাজে সর্বস্ব অর্পণ করেই তাঁদের তৃপ্তি।

স্বামীজীর শতবার্ষিকী উৎসবের সময় আমি প্রেমেশানন্দজীকে বলেছিলাম, ''ঠাকুরের 'গ্লোরি' খুব প্রকাশিত হচ্ছে দেখছি!'' তিনি বললেন, ''এটা ঠাকুরের গ্লোরি নয়। এটা ঠাকুরের গ্ল্যামার। পার্ষদ মহারাজরা তাঁকে চিন্তা করতেন যেভাবে—সেটাই ঠাকুরের লীলার 'গ্লোরিয়াস' অংশ।'' অর্থাৎ খেয়াল রাখতে হবে, যেখানে আধ্যাত্মিকতার সাক্ষাৎ স্পর্শ আছে সেটাই তাঁর 'গ্লোরি'।

প্রেমেশানন্দজীর সেবক ছিলাম। তিনি গঙ্গাজল আর জগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ রোজ খেতেন। একদিন মহাপ্রসাদ তাঁর মুখে দিয়ে গঙ্গাজল দেব বলে হাঁ করতে বলছি, মহারাজ মুখ খুলছেন না। কিছুক্ষণ পর বলছেন, ''গঙ্গাজলের চেয়েও পবিত্র জিনিস আমার কাছে আছে—রামকৃষ্ণ নাম।''

এইটিই সবকিছুর শেষকথা। ✠